

নয়নচারা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে ময়ূরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে। কিন্তু মনের চরে যখন ঘুমের বন্যা আসে, তখন মনে হয় ওটা সত্যিই ময়ূরাক্ষী : রাতের নিস্তব্ধতায় তার কালো শ্রোত কল-কল করে, দূরে আঁধারে ঢাকা তীররেখা নজরে পড়ে একটু-একটু, মধ্যজলে ভাসন্ত জেলেডিঙিগুলোর বিন্দু-বিন্দু লালচে আলো ঘন আঁধারেও সর্বসংসহা আশার মতো মৃদু-মৃদু জ্বলে।

তবে, ঘুমের শ্রোত সরে গেলে মনের চর শুষ্কতায় হাসে : ময়ূরাক্ষী! কোথায় ময়ূরাক্ষী! এখানে—তো কেমন বাপসা গরম হাওয়া। যে-হাওয়া নদীর বুক বেয়ে ভেসে আসে সে হাওয়া কি কখনো অত গরম হতে পারে?

ফুটপাথে ওরা সব এলিয়ে পড়ে রয়েছে। ছড়ানো খড় যেন। কিন্তু দুপুরের দিকে লঙ্গরখানায় দুটি খেতে পেয়েছিল বলে তবু তাদের ঘুম এসেছে— মৃত্যুর মতো নিঃসাড় নিশ্চল ঘুম। তবে আমুর চোখে ঘুম নেই, শুধু কখনো-কখনো কুয়াশা নাবে তন্দ্রার, এবং যদি-বা ঘুম এসে থাকে, সে-ঘুম মনে নয়—দেহে : মন তার জেগে রয়েছে চেনা নদীর ধারে, কখনো কল্পনায় কখনো নিশ্চিত বিশ্বাসে, এবং শুনছে তার অবিশ্রান্ত মৃদু কলস্বন, আর দূরে জেলেডিঙিগুলোর পানে চেয়ে ভাবছে। ভাবছে যে এরই মধ্যে হয়তো-বা ডিঙির খোদল ভরে উঠেছে বড়-বড় চকচকে মাছ—যে-চকচকে মাছ আগামীকাল চকচকে পয়সা হয়ে ফিরে ভারি করে তুলবে জেলেদের ট্যাক। আর হয়তো-বা—কী হয়তো-বা?

কিন্তু ভুতনিটা বড় কাশে। খক্কক খক্কক খ খ খ। একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না কেবল কাশে আর কাশে, শুনে মনে হয় দম বন্ধ না হলে ও কাশি আর থামছে না; তবু থামে আশ্চর্যভাবে, তারপর সে হাঁপায়। কাশে, কখনো-বা ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠে, অথচ ঘুম লেগে থাকে জোঁকের মতো। ভুতনির ভাই ভুতো কাশে না বটে তবে তার গলায় কেমন ঘড়-ঘড় আওয়াজ হয় একটানা, যেন ঘুমের গাড়িতে চেপে স্বপ্ন-চাকায় শব্দ তুলে সে কোথায় চলেছে যে চলেছে-ই। তাছাড়া সব শান্ত, নীরবতা পাখা গুটিয়ে নিশ্চল হয়ে রয়েছে, আর জমাট বাঁধা ঘনায়মান কালো রাত্রি পর্বতের মতো দীর্ঘ, বৃহৎ ও দুর্লভ্য।

ভুতনিটা এবার জোর আওয়াজে কেশে উঠল বলে আমুর মনের কুয়াশা কাটল। সে ভরা চোখে তাকাল ওপরের পানে—তারার পানে, এবং অকস্মাৎ অবাক হয়ে ভাবল, ওই তারাগুলিই কি সে বাড়ি থেকে চেয়ে চেয়ে দেখত? কিন্তু সে-তারাগুলোর নিচে ছিল ঢালা মাঠ, ভাঙা মাটি, ঘাস, শস্য, আর ময়ূরাক্ষী। আর এ-তারাগুলোর নিচে খাদ্য নেই, দয়ামায়া নেই, রয়েছে শুধু হিংসাবিদ্বেষ নিষ্ঠুরতা, অসহ্য বৈরিতা।

কিন্তু তবু ওরা তারা। তাদের ভালো লাগে। আর তাদের পানে চাইলে কী যেন হঠাৎ সমস্ত কিছু ছাপিয়ে বিপুল বাহু মেলে আসে, আসে। কিন্তু যা এসেছিল, মুহূর্তে তা সব শূন্য রিস্ত করে দিয়ে গেল। কিছু নেই...। শুধু ঘুম নেই। কিন্তু তাই যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করছে। নদীতে জোয়ার না ভাটা? মনে হচ্ছে ভাটা, এবং এ-ভাটাতো ভেসে যাবার প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে তার। সে ভেসে যাবে, যাবে, প্রশস্ত নদী তাকে নিয়ে যাবে ভাসিয়ে, দূরে বহুদূরে— কোথায় গো? যেখানে শান্তি—সেইখানে? কিন্তু সেই শান্তি কি বিস্তৃত বালুচরের শান্তি?

তবে এখানে মানুষের পায়ের আওয়াজ হয়। আর এখানে শহর। মন্তরগতিতে চলা একজোড়া পায়ের আওয়াজ ঘুরে আসছে গলি দিয়ে, এবং নদীর মতো প্রশস্ত এ-রাস্তায় সে যখন এল তখন আমু বিস্মিত হয়ে দেখল যে লোকটির মধ্যে শয়তানের চোখ জ্বলছে, আর সে-চোখ হীনতায় ক্ষুদ্রতম ও ক্রোধে রক্তবর্ণ। হয়তো-বা সেটা শয়তানের চোখ নয়, হয়তো শুধুমাত্র একটা বিড়ি। তাহলে অদৃশ্যপ্রায় কালো শয়তানের হাতে

বিড়ি, যেটা দুলছে কেবল তার হাতের দোলার সাথে। শয়তানকে দেখে বিস্ময় লাগে, বিস্ময়ে চোখ ঠিকরে যায়, ঘন অন্ধকারে তাতে আগুন ওঠে জ্বলে। তবে শুধু এই বিস্ময়-ই : ভয় করে না একটু-ও : বরঞ্চ সে যেন শয়তানের সাথে মুখোমুখি দেখা করবার জন্যে অপেক্ষমাণ। তাছাড়া, রাস্তার অপর পাশের বাড়িটার একটি বন্ধ জানালা থেকে যে উজ্জ্বল ও সরু একটা আলোরেখা দীর্ঘ হয়ে রয়েছে, সে-আলোরেখায় যখন গতিরুদ্ধ স্তব্ধতা, তখন শয়তানের হাতে আগুন জ্বলতে দেখলে আরো ক্রোধ হয় মানুষের। আগুনটা দুলছে না তো যেন হাসছে : আমুরা যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় কঁকায়—তখন পথচলতি লোকেরা যেমন আলাদা অপরিচিত দুনিয়ার কোনো অজানা কথা নিয়ে হাসে, এ-ও যেন তেমনি হাসছে। কিন্তু কেন হাসবে? দীর্ঘ-উজ্জ্বল সে-রেখাকে তার ভয় নেই? জানে না সে যে ওটা খোদার দৃষ্টি—অকম্পিত দ্বিধাশূন্য ঋজু দৃষ্টি? তবু আলো-কণা হাসে, হাসে কেবল, পেছনে কালো শয়তান কালো রঙে হাসে। তা হাসুক, আলাদা দুনিয়ায় হাসুক, কারো কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এ-দুনিয়ায়—যে-দুনিয়ায় ঘর ছেড়ে লোকেরা কালো নদীর ধারে-ধারে পড়ে রয়েছে ভাটির টানে ভেসে যাবে বলে, সে-দুনিয়ায় তাকে সে হাসতে দেবে না—দেবে না।

তবু কালো শয়তান রহস্যময়ভাবে এগিয়ে আসছে, শূন্য ভাসতে ভাসতে যেন এগিয়ে আসছে ক্রমশ, এসে, কী আশ্চর্য, আলোরেখাটাও পেরিয়ে গেল নির্ভয়ে, এবং গতিরুদ্ধ দীর্ঘ সে-রেখা বাধা দিল না তাকে। মৃতগতির পানে চেয়ে নদীর বুকে তারপর নাবল কুয়াশা : আমুর চোখে পরাজয় ঘুম হয়ে নাবল। পরাজয় মেনে নেয়াতে-ও যেন শান্তি।

রোদদন্ধ দিন খরখর করে। আশ্চর্য কিন্তু একটা কথা : শহরের কুকুরের চোখে বৈরিতা নেই। (এখানে মানুষের চোখে, এবং দেশে কুকুরের চোখে বৈরিতা।) তবু ভালো।

ময়রার দোকানে মাছি বোঁ বোঁ করে। ময়রার চোখে কিন্তু নেই ননী-কোমলতা, সে-চোখময় পাশবিক হিংস্রতা। এত হিংস্রতা যে মনে হয় চারধারে ঘন অন্ধকারের মধ্যে দুটো ভয়ঙ্কর চোখ ধক্ক করে জ্বলছে। ওধারে একটা দোকানে যে ক-কাঁড়ি কলা বুলছে, সেদিক পানে চেয়ে তবু চোখ জুড়ায়। ওগুলো কলা নয়তো, যেন হলুদ-রঙা স্বপ্ন বুলছে। বুলছে দেখে ভয় করে—নিচে কাদায় ছিঁড়ে পড়বে কি হঠাৎ? তবু, শঙ্কা ছাপিয়ে আমুর মন উর্ধ্বপানে মুখ করে কেঁদে ওঠে, কোথায় গো, কোথায় গো নয়নচারা গাঁ?

লালপেড়ে শাড়ি ঝলকাচ্ছে : রক্ত ছুটছে। যেমন করিম মিঞার মুখ দিয়ে সেদিন ফিনকি দিয়ে ছুটেছিল রক্ত। তবে মেয়েটার গলার নিচেটা সাদা, এত সাদা যে মনটা হঠাৎ স্নেহের ছায়ায় ছুটে গিয়ে উপড় হয়ে পড়বার জন্যে খাঁখাঁ করে ওঠে। মেয়েটি হঠাৎ দুটি পয়সা দিয়ে চলে গেল রক্ত ঝলকিয়ে। কিন্তু একটা কথা : ও কি ভেবেছে যে তার মাথায় সাজানো চুল তারই? আমু কি জানে না—আসলে ও চুল কার। ও-চুল নয়নচারা গাঁয়ের মেয়ে ঝিরার মাথার ঘন কালো চুল।

কিন্তু পথে কত কালো গো। অদ্ভুত চাঞ্চল্যময় অসংখ্য অ-গুণতি মাথা; কোন-সে অজ্ঞাত হাওয়ায় দোলায়িত এ-কালো রঙের সাগর। এমন সে দেখেছে শুধু ধানক্ষেতে, হাওয়ায় দোলানো ধানের ক্ষেতের সাথে এর তুলনা করা চলে। তবু তাতে আর এতে কত তফাত। মাথা কালো, জমি কালো, মন কালো। আর দেহের সাথে জমির কোনো যোগাযোগ নেই, যে—হাওয়ায় তারা চঞ্চল কম্প্রমান, সে-হাওয়াও দিগন্ত থেকে উঠে-আসা সবুজ শস্য কাঁপানো সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গ হাওয়া নয় : এ-হাওয়াকে সে চেনে না।

অসহ্য রোদ। গাছ নেই। ছায়া নেই নিচে, কোমল ঘাস নেই। এটা কী রকম কথা : ক্লান্তিতে দেহ ভেঙে আসছে অথচ ছায়া নেই ঘাস নেই। আরো বিরস্তিকর—এ-কথা যে কাউকে বলবে, এমন কোনো লোক নেই। এখানে ইটের দেশে-তো কেউ নেই-ই, তার দেশের যারা-বা আছে তারাও মন হারিয়েছে, শুধু গোঙানো পেট তাদের হা করে রয়েছে। অন্ধ চোখে চেয়ে।

তবু যাক, ভুতনি আসছে দেখা গেল। কী রে ভুতনি? ভুতনি উত্তর দিলে না, তার চোখ শুধু ড্যাব-ড্যাব করছে, আর গরম হাওয়ায় জট-পড়া চুল উড়বার চেষ্টা করছে। কিন্তু কী রে ভুতনি? ভুতনি এবার নাক ওপরের দিকে তুলে কম্পমান জিহ্বা দেখিয়ে হঠাৎ কঁদে ফেললে ভাঁ করে। কেউ দিল না বুঝি, পেট বুঝি ছিঁড়ে যাচ্ছে? কিন্তু একটা মজা হয়েছে কী জানিস, কোথেকে একটা মেয়ে রক্ত ছিটাতে ছিটাতে এসে আমাকে দুটো পয়সা দিয়ে চলে গেল, তার মাথায় আমাদের সেই ঝিরার মাথার চুল—তেমনি ঘন, তেমনি কালো...। আর তার গলার নিচেটা—। ভুতনির গলার তলে ময়লা শুকনো কাদার মতো লেগে রয়েছে। থাক সে কথা কিন্তু তুই কাঁদছিস ভুতনি? ভুতনি, ওরে ভুতনি?

কী একটা বলে ফেলে ভুতনি চোখ মুখ লাল করে কাশতে শুরু করল। তার ভাই ভুতো মারা গেছে। কোনো নতুন কথা নয়, পুরোনো কথা শুধু আবার বলা হল। সে মরেছে, ও মরেছে; কে মরেছে বা কে মরছে সেটা কোনো প্রশ্ন নয়, আর মরছে মরেছে কথা দু-রঙা দানায় গাঁথা মালা, অথবা রাস্তায় দু-ধারের সারি-সারি বাড়ি—যে-বাড়িগুলো অদ্ভুতভাবে অচেনা অপরিচিত, মনে হয় নেই অথচ কেমন আলগোছে অবশ্য রয়েছে।

ভুতনির কান্না কাশির মধ্যে হারিয়ে গেল। কাশি থামলে ভুতনি হঠাৎ বললে, পয়সা? তার পয়সার কথাই যেন শুধোচ্ছে। হ্যাঁ, দুটো পয়সা আমুর কাছে আছে বটে কিন্তু আমু তা দেবে কেন? ভুতনির চোখ কান্নায় প্যাক-প্যাক করছে, আর কিছু-কিছু জ্বলছে। কিন্তু আমু কেন দেবে? ভুতনি আরো কাঁদল, আগের চেয়ে এবার আরো তীব্রভাবে। তাই দেখে আমুর চোখ জ্বলে উঠল। চোখ যখন জ্বলে উঠল তখন দেহ জ্বলতে আর কতক্ষণ : একটা বিদ্রোহ—একটা ক্ষুরধার অভিমান ধাঁধাঁ করে জ্বলে উঠল সারা দেহময়। তাতে তবু কেমন যেন প্রতিহিংসার উজ্জ্বলন্ত উপশম।

সন্ধে হয়ে উঠছে। বহু অচেনা পথে ঘুরে-ঘুরে আমু জানলে যে ও-পথগুলো পরের জন্যে, তার জন্যে নয়। রূপকথার দানবের মতো শহরের মানুষরা সায়ন্তন ঘরাভিমুখ চাঞ্চল্যে থরথর করে কাঁপছে। কোন—সে গুহায় ফিরে যাবার জন্যে তাদের এ-উদগ্র ব্যস্ততা? সে-গুহা কি ক্ষুধার? এবং সে-গুহায় কি স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে মাংসের টিলা, ভাতের পাহাড়, মাছের স্তূপ? কত বৃহৎ সে-গুহা?

অচেনা আকাশের তলে অচেনা সন্ধ্যায় আমুর অন্তরে একটা অচেনা মন ধীরে-ধীরে কথা কয়ে উঠছে। ক্ষীণ তার আওয়াজ, তবু মনে হয় গুহার পানে প্রবাহিত এ-বিপুল জলস্রোতকে ছাপিয়ে উঠছে তা। কী কইছে সে? অস্পষ্ট তার কথা অথচ সে-অস্পষ্টতা অতি উগ্র : মানুষের ভাষা নয়, জন্তুর হিংস্র আর্তনাদ। কী? এই সন্ধ্যা না হয় অচেনা সন্ধ্যা হল : রূপকথার সন্ধ্যা-ও তো সন্ধ্যা, কিন্তু তবু সন্ধ্যা, আর এ-সন্ধ্যায় তুমি আমাকে নির্মমভাবে কন্টকাকীর্ণ প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ? কে তুমি, তুমি কে? জানো, সারা আকাশ আমি বিষাক্ত রুক্ষ জিহ্বা দিয়ে চাটব, চেটে-চেটে তেমনি নির্মমভাবে রক্ত ঝরাব সে-আকাশ দিয়ে—কে তুমি, তুমি কে?

আমুর সমস্ত মন স্তব্ধ, এবং নুয়ে রয়েছে অনুতপ্ত অপরাধীর মতো। সে ক্ষমা চায় : শক্তিশালীর কাছে সে ক্ষমা চায়। যেহেতু শক্তিশালীর অন্যায়ও ন্যায়, সে-ন্যায়ে প্রতি অন্যায় করা গুরুতর পাপ। সে পাপ করেছে, এবং তাই সে ক্ষমা চায় : দুটি ভাত দিয়ে শক্তিশালী তাকে ক্ষমা করুক। চারধারে তো রাত্রির ঘন অন্ধকার, শক্তিশালীর ক্ষমা করার কথা জানবে না কেউ, শুনবে না কেউ।

ওধারে কুকুরে-কুকুরে কামড়াকামড়ি লেগেছে। মনের এ-পবিত্র সান্ত্বনায় সে-কোলাহলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ অসহনীয় মনে হল বলে হঠাৎ আমু দূর-দূর বলে চৈঁচিয়ে উঠল, তারপর জানল যে ওরা মানুষ, কুকুর নয়! অথবা ভেতরে কুকুর, বাইরে কুকুর নয়

কিন্তু আমু মানুষ, ভেতরে-বাইরে মানুষ। সে মাপ চায়। কিছুক্ষণ পর সে হঠাৎ উঠে পড়ল, তারপর অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিসের সন্ধানে যেন তাকাল রাস্তার ক্ষীণ আলো এবং দুপাশের স্বপ্নালোকিত জানালাগুলোর পানে। একতলা দোতলা তেতলা—আরো উঁচুতে স্বপ্নালোকিত জানালা ধরাছোঁয়ার বাইরে! তুমি কি ওখানে থাক?

তারপর কখন মাথায় ধোঁয়া উড়তে লাগল। এবং কথাগুলো মাথায় ধোঁয়া হয়ে উড়ছে : উদরের অসহ্য তাপে জমাট কথাগুলো ধোঁয়া হয়ে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। আর গলাটা যেন সুড়ঙ্গ, আমু শুনতে পারছে বেশ যে, কেমন একটি অতি ক্ষীণ আওয়াজ সে-গভীর ও ফাঁকা সুড়ঙ্গ বেয়ে পৌঁচিয়ে-পৌঁচিয়ে উঠে আসছে ওপরের পানে এবং অবশেষে বাইরে যখন মুক্তি পেল তখন তার আঘাতে অন্ধকারে ঢেউ জাগল, ঢেউগুলো দু-ধারের খোলা-চোখে—ঘুমন্ত বাড়িগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল তার কানে। মা-গো, চাট্টি খেতে দাও—

এই পথ, ওই পথ : এখানে পথের শেষ নেই। এখানে ঘরে পৌঁছানো যায় না। ঘর দেখা গেলে-ও কিছুতেই পৌঁছানো যাবে না সেখানে। ময়রার দোকানে আলো জ্বলে, কারা খেতে আসে, কারা খায়, আর পয়সা বানবান করে : কিন্তু এধারে কাচ। কাচের এপাশে মাছি, আর পথ আর আমু। তবু দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভেতর থেকে কে একটি লোক বাজের মতো খাইখাই করে তেড়ে এল। আরে, লোকটি অন্ধ নাকি? মনে-মনে আমু হঠাৎ হাসল একচোট, অন্ধ না হলে অমন করবে কেন? দেখতে পেত না যে সে মানুষ?

পথে নেবে আমু ভাবলে, একবার সে শুনেছিল শহরের লোকেরা অন্ধ হলে নাকি শোভার জন্যে নকল চোখ পরে। দোকানের লোকটি অন্ধ-ই, আর তার চোখে সে নকল চোখ। কিছু একটা আওয়াজ শুনে হয়তো ভেবেছে বাইরে কুকুর, তাই তেড়ে উঠেছিল অমন করে। কিন্তু সে-কথা যাক, আশ্চর্য হতে হয় কাণ্ড দেখে, নকল চোখে আর আসল চোখে তফাত নেই কিছু

তারপর মাথায় আবার ধোঁয়া উড়তে লাগল। ময়রাক্ষীর তীরে কুয়াশা নেবেছে। স্তব্ধ দুপুর : শান্ত নদী। দূরে একটি নৌকায় খরতাল বানবান করছে, আর এধারে শ্মশানঘাটে মৃতদেহ পুড়ছে। ভয় নেই। মৃত্যু কোথায়? মৃত্যুকে সে পেরিয়ে এসেছে, আর অলিগলি দিয়ে ঘুরে মৃত্যুহীনতার উন্মুক্ত সদর রাস্তায় সে এসে পড়েছে।

কড়া একটা গন্ধ নাকে লাগছে। কী কোলাহল। লোকেরা আসছে, যাচ্ছে। হোটেল। দাঁড়াবে কি এখানে? দাঁড়ালেও দাঁড়াতে পারে, তবে নকল-চোখপরা কোনো অন্ধ-তো নেই এখানে, আওয়াজ পেয়ে তেড়ে আসবে না-তো খাইখাই করে? কিন্তু গন্ধটা চমৎকার। তারপর বোশেখ মাসে শূন্য আকাশ হঠাৎ যেমন মেঘে ছেয়ে যায়, তেমনি দেখতে না দেখতে একটা ভীষণ কালো ক্রোধে তার ভেতরটা করাল হয়ে উঠল, আর কাঁপতে থাকল সে থরথর করে : সিঁড়ির ধারে একটা প্রতিবাদী ভঙ্গিতে সে রইল দাঁড়িয়ে। অবশেষে ভেতর থেকে কে চৈঁচিয়ে উঠল, আরেকজন দ্রুত পায়ে এল এগিয়ে, এসে হীন ভাষায় কর্কশ গলায় তাকে গালাগাল দিয়ে উঠল। এইজন্যেই আমু প্রস্তুত হয়ে ছিল। হঠাৎ সে ক্ষিপ্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর, এবং তারপর চকিতেঘটিত বহু ঝড়-ঝাপটার পর দেহে অসহ্য বেদনা নিয়ে আবার যখন সে পথ ধরল, তখন হঠাৎ কেমন হয়ে একবার ভাবলে : যে-লোকটা তাড়া করে এসেছিল সে-ও যদি ময়রার দোকানের লোকটার মতো অন্ধ হয়ে থাকে? হয়তো সে-ও অন্ধ, তার-ও চোখ নকল। শহরে এত-এত লোক কি অন্ধ? বিচিত্র জায়গা এই শহর।

চাঞ্চল্যকর ঘটনাটির পর উত্তেজিত মাথা ঠাণ্ডা হতে সময় নিল এবং সে উত্তেজনার মধ্যে কোন রাস্তা হতে কোন কোন রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে হঠাৎ এক সময়ে সে থমকে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে ভাবল : যে-পথের শেষ নেই, সে-পথে চলে লাভ নেই, বরঞ্চ ওই যে ওখানে কে কঁকাচ্ছে সেখানে গিয়ে দেখা যাক কী হয়েছে তার। ফুটপাথের ধারে গ্যাসপোস্ট, তার তলে আবছা অন্ধকারে কে একটা লোক শুয়ে রয়েছে, আর পেটে হাত চেপে দূরন্ত বেদনায় গোঙাচ্ছে। তার একটু তফাতে যে কটা লোক উবু হয়ে বসে রয়েছে তাদের মুখে কোনো সাড়া নেই, শুধু তারা নিঃশব্দে ধুকছে। আমু কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আপন মনে থমকে ভাবল, ওদের সঙ্গে তার চেনা নেই, ওদের বেদনার সঙ্গে তার পরিচয় নেই, সে কেন যাবে তাদের কাছে। যাবে না। তারপর কেমন একটা চাপা ভয়ে সে যেন ভাঙা পা নিয়ে পালিয়ে চলল। কী যে সে-ভয় সে-কথা সে স্পষ্ট বলতে পারবে না, এবং সে-কথা জানবারও কোনো তাগিদ নেই, শুধু যে কেমন একটা ভয় কালো ছায়াচ্ছন্ন করে তুলেছে তার সারা অন্তর, সে ভয় হতে মুক্তি পাবার জন্যে সে পালিয়ে যাবে সে-রাস্তা দিয়েই, যে-রাস্তার কোনো শেষ নেই। যে-ছায়া ঘনিয়েছে মনে, তারও কি শেষ নেই? আর, সে-ছায়া কি মৃত্যুর?

অনেকক্ষণ পর তার খেয়াল হল যে একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, আর তার গলার সুড়ঙ্গ দিয়ে একটা আর্তনাদ বেয়ে বেয়ে উঠছে ওপরের পানে, এবং যখন সে আর্তনাদ শূন্যতায় মুক্তি পেল, রাত্রির বিপুল অন্ধকারে মুক্তি পেল, অত্যন্ত বীভৎস ও ভয়ঙ্কর শোনাৎ তা। এ কি তার গলা—তার আর্তনাদ? সে কি উন্মাদ হয়ে উঠেছে? অথবা কোনো দানো কি ঘর নিয়েছে তার মধ্যে? তবু, তবু, তার মনের প্রশ্নকে উপেক্ষা করে সুড়ঙ্গের মতো গলা বেয়ে তীক্ষ্ণ তীব্র বীভৎস আর্তনাদের পর আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে লাগল, আর সে থরথর করে কাঁপতে লাগল আপাদমস্তক। অবশেষে দরজার প্রাণ কাঁপল, কে একটা মেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল, এসে অতি আস্তে-আস্তে অতি শান্তগলায় শুধু বললে : নাও।

কী? কী সে নেবে? ভাত নেবে। ভাতই কি সে চায়? সে ভাতই চায় : এ-দুনিয়ায় চাইবার হয়তো আরো অনেক কিছু আছে, কিন্তু তাদের নাম সে জানে না। ব্রহ্মভঙ্গিতে ময়লা কাপড়ের প্রান্ত মেলে ধরে সে ভাতটুকু নিলে, নিয়ে মুখ তুলে কয়েক মুহূর্ত নিম্পলক চোখে চেয়ে রইল মেয়েটির পানে। মনে হচ্ছে যেন চেনা-চেনা। না হলে সে চোখ ফেরাতে পারবে না কেন।

—নয়নচারী গাঁয়ে কি মায়ের বাড়ি?

মেয়েটি কোনো উত্তর দিলে না। শুধু একটু বিস্ময় নিয়ে কয়েক মুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে। ##

সংগ্রহ: মো. মেহেদী হাসান, প্রভাষক (বাংলা), এডজান্ট ফ্যাকাল্টি, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।